DEPARTMENT OF BENGALI
ANNADAMANGOL
SEM-II (HONS), CC-4
DR.SWAPNA DAS

দেবী অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী

বাংলার লোকজীবনে অন্নপূর্ণা কেবল দেবী নন, এমনকি তিনি শুধু শস্যের টোটেম হিসেবেও বিবেচ্য নন। প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মর্মেও তিনি আছেন। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' অন্নদামঙ্গল কাব্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের এই প্রার্থনার মধ্যেই দেবী অন্নপূর্ণার লৌকিক তাৎপর্য ফুটে ওঠে। বাংলার দেব-দেবীদের মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক এবং এখানকার দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহের মধ্য থেকেই এসব দেবদেবীর মিথিক্যাল নির্মাণ। সেই লোকভাব ভীষণভাবে মূর্ত হয় অন্নপূর্ণায়। পার্বতী বা গৌরী, কালী, তারা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণাসহ সব দেবীর ধারণা অখন্ড বঙ্গের স্থান ও কালচেতনা থেকেই গড়ে উঠেছে। বাংলার লৌকিক পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত, জীবনযাপন, টোটেমসমূহ থেকেই এসব দেবীর কল্পনা। অন্নপূর্ণা -এই নামের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রয়েছে 'অন্ন' শব্দটি 'অন্ন' শব্দটির মূল অর্থ 'ভাত', যা এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য। খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যশৃঙ্খল যে যাপনচিত্র নির্মাণ করে, তা প্রসারিত হয়ে সংস্কৃতির আকার নেয়। অন্নপূর্ণা নামটির মধ্যে অন্নের যে বিষয়টি মূল বিশেষ্য হিসেবে হাজির, তা বাংলার যাপনসংস্কৃতির প্রধান উপাদান। এদিক থেকে অন্নপূর্ণা নামটি এই দেবীকে পৌরাণিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সরাসরি বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। কৃষিকেন্দ্রিক বঙ্গের প্রজন্মপরম্পরার ক্ষুধানিবৃত্তির মূল ভরসার যে উপাদান, সেই অন্নের ভেতর থেকে মূর্ত হয়ে ওঠেন দেবী অন্নপূর্ণা।

মূলত অন্নপূর্ণাপূজা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসে। ঋতুরাজ বসন্তে যখন ফুলে-ফলে ভরে ওঠে প্রকৃতি, ঠিক এই সময়ে পূজিতা হন অন্নপূর্ণা। এই পূজাকেই কোথাও কোথাও আবার বাসন্তীপূজা হিসেবে পালন করা হয়। বাসন্তী দেবীও দুর্গার মতো মহিষমর্দিনী। কিন্তু মহিষমর্দিনী প্রতিমার এই রূপের অনেক অনেক আগে থেকে বাংলায় হাজির হরগৌরী যুগল। এই যুগল প্রতিমার আরেকটি লৌকিক সংস্করণ অন্নপূর্ণা ও শিব। উল্লেখ্য, শরৎকালে যে দুর্গাপূজা আমরা দেখি, তা হলো অকালবোধন; যা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের আগের। অকালে দেবীবন্দনার আখ্যাননির্ভর। তবে তা বাংলায় অনেক পরে এসেছে। আরও অনেক আগে থেকে বসন্তকালে মহিষমর্দিনী পূজিতা হন। আবার সামগ্রিকভাবে মহিষমর্দিনী প্রতিমাও বাংলায় আর্য আগমনের পরে এসেছে। তার আগে থেকেই এখানকার অবৈদিক সনাতন ভাবধারায় হাজির থেকেছে পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল রূপ।

মাতৃপূজা বা প্রকৃতিপূজার সূত্রেই সেই পুরুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের সৃষ্টি। প্রাণস্পন্দন ও প্রকৃতির বন্দনা অখন্ড বাংলার নিজস্ব।

অন্নপূর্ণা দশভুজা বা চতুর্ভুজা নন। মানুষের মতোই তিনি দ্বিভুজা। বাংলায় লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীও যেমন। এই প্রতিমা নেহাতই সুসজ্জিত অভিজাত এক অপরূপা মানবীর মতোই। দেখে বোঝা যায়, তিনি গৃহবধূ। তাঁর নিজ গৃহের সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে ভিক্ষা করতে এসেছেন শিব। তাঁর কন্ঠে সাপ আর পরনে বাঘছাল, অঙ্গ ভস্মমাখাÑ এমন চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তি করতে তিনি হাজির হয়েছেন অন্নপূর্ণার দরজায়। দেবী তাঁকে অন্নদান করছেন। অন্নপূর্ণা ও শিবের এই যুগলছবিই আমরা দেখতে পাই। এই দুই দেবদেবীকে নিয়েই সামগ্রিকভাবে অন্নপূর্ণা মূর্ত হন। গিরিরাজ কন্যা, শ্মশানচারী মহাদেবের স্ত্রী, সেই পার্বতীর লৌকিক রূপান্তর হচ্ছেন অন্নপূর্ণা। কিন্তু শিব তো দেবীর স্বামী, তাঁকে কেন স্ত্রীর দ্বারে এসে ভিক্ষা নিতে হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বুঝতে হবে পৌরাণিক আখ্যানের লৌকিক বিনির্মাণ ও তার সমাজতাত্ত্বিক কার্যকারণ আর বাংলার প্রকৃতি ও ভাবজগৎকে। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব। তার আগে, অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবীর লোকমাহাত্ম্যের বিষয়টি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ‘কাশীখন্ড উপপুরাণ’, ‘চৌরীসুরত পঞ্চশিকা’ ও ‘ক্ষিতিশবংশাবলী’ চরিতম ইত্যাদি গ্রন্থ এবং নানা লোকশ্রুতি থেকে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে এই কাব্য রাজসভায় লিখিত। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক তাঁর রাজত্বে অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে তাঁর কীর্তির বর্ণনা, দেবীর আশীর্বাদে কীভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার রাজত্ব ও খেতাব লাভ করলেন, এসব বর্ণনার ভেতরে ভারতচন্দ্র কিন্তু দেবীর পৌরাণিক আখ্যানকে লৌকিক আখ্যানে অনেকাংশে বিনির্মাণও করেছিলেন। স্মরণ করা দরকার, অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খন্ড। এগুলো হলো ১. অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এবং ৩. মানসিংহ- ভবানন্দ উপাখ্যান। ১৭৭৬-১৮১৬, এই কালপর্বের কোনো একটি সময় অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম পুঁথিটি পাওয়া যায়। যদিও ভারতচন্দ্রের সময়কাল হলো ১৭১২-১৭৬০। প্রথমে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য মুদ্রিত হয়। এরপর ১৮৪৭ ও ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক এই কাব্যের দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতচন্দ্র নিজে এই কাব্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের থেকে নতুন বলেছেন। এর আগে, বাংলার অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে লোকদৈব মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে, আর এখানে দেবীমাহাত্ম্যের পাশাপাশি ভবানন্দ মজুমদারের জয়গাথা বর্ণিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তার সঙ্গে ঈশ্বরী পাটনির মতো গ্রামবাংলার অতিসাধারণ খেয়ামাঝির যাপন এবং তার সরল লৌকিক প্রার্থনা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে

এখানে নতুন মাত্রা পেয়েছে। তাই অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়রা যতই অন্নদামঙ্গলকে ‘রাজসভায় রচিত’ কাব্য বলুন না কেন, রাজসভার বাইরের যে প্রজাসমাজ, তার সঙ্গে অন্নের সম্পর্কের জায়গাটি পরোক্ষে ফুটে উঠেছে। খেয়া পারাপারের জন্য কুলবধূর ছদ্মবেশে নদীর ঘাটে হাজির হয়েছেন দেবী অন্নপূর্ণা। নদী পার করে দিতে বলছেন মাঝিকে, কিন্তু একাকী কুলবধূকে পার করতে মাঝি রাজি নন। কারণ, লোকভয়, কে কী বলবেন! তাই দেবীকে তিনি বলছেন, ‘পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার/ ভয় করি কী জানি কে দিবে ফেরফার’! উত্তরে ঈশ্বরী মাঝিকে ঈশ্বরী অর্থাৎ দেবী তাঁর পরিচয় দেন, ‘বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি/ বিশেষণে সবিশেষ কহিতে না পারি/ জানহ স্বামীর নাম মুখে নাহি ধরে নারী’। এরপর নৌকার পাটাতনে দেবীকে রাঙা চরণ রাখতে বলেন। খেয়ামাঝি ঈশ্বরী পাটনীর বক্তব্য ‘সেঁউতী উপরে রাখো ও রাঙ্গা চরণ’। এরপর আলতা রাঙা পদযুগল নৌকার পাটাতনে রাখেন দেবী। আর তারপরেই বাংলা কাব্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয় সেই স্বর্ণ-জাদুবাস্তব পরিণতি। ‘পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।/ রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে।।/ সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।/ সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।’ কিন্তু সেঁউতি সোনা হয়ে উঠলে, ভয় পান গরিব মাঝি। তিনি বুঝতে পারেন, নৌকায় যিনি রয়েছেন তিনি কোনো সাধারণ কুলবধূ নন। তিনি দেবী। মাঝি বললেন-

‘তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার।।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া।।’

নেহাতই সাধারণ গরিব মাঝি, দৈববন্দনার জ্ঞান তার নেই। কিন্তু তারপরেও দেবী যে দেখা দিয়েছেন তাকে, এই আনন্দে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত। লক্ষণীয়, মাঝি-মল্লার, চাষি, মৎস্যজীবী, চন্ডালÑ বাংলার এই আদি গণবিন্যাসকে নিম্নবর্ণ, শূদ্র, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি মনে করত বৈদিক সমাজ। বাংলার তন্ত্রসহ নানা প্রকৃতিনিবিড় কাল্টও বৈদিক সমাজের বহু আগে থেকেই

এখানে বহমান। কিন্তু আর্য আগমন-পরবর্তী সময়ে স্মার্তব্রাহ্মণদের হাত ধরে সংস্কৃতকে দেবতার ভাষা, জ্ঞানচর্চার ভাষা ইত্যাদি হিসেবে তুলে ধরে ব্রাহ্মণ ও বাংলার গণ-অব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে দেয়াল তোলা হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই দৈববন্দনা বা আর্য-আলোকায়নের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সমান দূরত্ব তৈরি হয়েছে লোকসমাজের। সেহেতু পাটনী মাঝি বলছেন, তিনি তপজপ কিছুই জানেন না, অথচ তাকেই স্বর্গের দেবী দেখা দিয়েছেন! এর আগে নৌকায় দেবী তাঁর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে অকর্ম, নির্গুণ, অলস স্বামী শিবের ব্যাপারে নানা আক্ষেপমূলক কথাও বলছেন, যেমন ‘কোনো গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন...’ আরও বলছেন, পিতা এবং স্বামী কুলীন বংশের হওয়ার পরেও স্বামীর মুখে খালি কুকথা, তিনি কেবল তাঁর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন ইত্যাদি... এই কথা শুনে কিন্তু মাঝির সটান উত্তর, ‘যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল’... অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এখানকার গণসমাজের বিদ্যমান ক্ষোভ তার কথার মধ্যে ধরে রেখেছেন ঈশ্বরী মাঝি। যা হোক, নিজের দৈবসত্তা প্রকাশের পর তাকে দেবী বলেন-

‘আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।
কত দিন ছিনু হরিহরের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কোন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনমতো যাহা চাহ দিব।।’

দেবী জানালেন, কাশীতে তার নিবাস হলেও তিনি এখন বাংলায়। হরিহরের বাড়ি ছেড়েছেন কোন্দলের জেরে। এখন থেকে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়িতে থাকবেন। এরপর দেবী মাঝিকে বর (আশীর্বাদ) চাইতে বললেন। তখন পাটনী মাঝির সেই বিখ্যাত প্রার্থনা, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’।

স্বর্ণ-মুদ্রা-বিত্ত ইত্যাদি নয়, দুধভাতের নিশ্চয়তাই প্রার্থনা ঈশ্বরী মাঝির। সেই প্রার্থনায় নিশ্চয়তা দিয়েছেন দেবী। অনেকে মনে করেন, ভবানন্দ মজুমদার এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম যাঁরা নদীয়ার রাজকার্য চালনা করেছেন, তাঁরা যে প্রজাদের প্রতি খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের বিষয়ে দায়বদ্ধ,

এটা বোঝানোর জন্য কৃষ্ণচন্দ্র রায় সভাকবি ভারতচন্দ্রকে দিয়ে অন্নপূর্ণার মহিমা লিখিয়ে নিয়েছেন। কারণ, অন্নপূর্ণা অন্নের জোগানদাত্রী এবং তিনি ভবানন্দ মজুমদারের গৃহেই স্থিত হয়েছেন। তবে প্রেরণা এই রাজ-আশ্বাসের জায়গা থেকে ঈশ্বরী পাটনী ও দেবী অন্নপূর্ণার আলাপের ডিসকোর্স তৈরি হয় না। দেবী আর্য বলয় ছেড়ে বাংলায় এসে নিজেকে লৌকিক করে তুলছেন, তিনি কুলীন ঘরের বউ হয়েও নিম্নবর্গের মাঝির নৌকায় নদী পারাপার করছেন, কুলীন ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য শুনছেন মাঝির থেকে, তারপরেও তাকে বর দিচ্ছেন। এগুলো থেকে স্পষ্ট, বৈদিক ডিসকোর্সের পুরাণ নয়, বরং বাংলার যে আদি প্রকৃতিনিবিড় যাপন- তা থেকে যে লোকশ্রুতি তৈরি হয়, তার মিথকেই উত্তর ভারতীয় মিথের থেকে বড় করে তুলে ধরেছেন বাংলার কবি ভারতচন্দ্র। তিনি বুঝিয়েছেন, বাংলার লোকজগতে অন্ননির্ভরতাটাই আসল।

এবার আসি অন্নপূর্ণাকে ঘিরে বিদ্যমান পৌরাণিক আখ্যান এবং তার সমাজতাত্ত্বিক বয়ানে। অন্নদামঙ্গলের সূচনাতেও এটি রয়েছে। লৌকিক প্রেক্ষাপটে যিনি অন্নপূর্ণা, পুরাণে তিনিই সতী। এই সতীকে আবার আমরা পার্বতী অথবা গৌরী নামেও চিনি। সতী প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। তাঁর বিবাহ হয়েছে শিবের সঙ্গে। যিনি কিনা ভূতপ্রেতের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। গাঁজা-ভাঙ-সিদ্ধি খেয়ে দিন যাপন করেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিনি সতী অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। সতীও শিব ছাড়া ত্রিভুবনে অন্য কাউকে পুরুষ হিসেবে দেখেন না। সতীর বাপের বাড়িতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। তাতে দক্ষরাজ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সমাজের গণ্যমান্যদের। কিন্তু শিব যেহেতু ডি-ক্লাসড, কর্পদকহীন এবং প্রান্তজনের সঙ্গে তাঁর সখ্য- তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও বাপের বাড়িতে হাজির হন সতী। বিত্তবান বাপের বাড়িতে তাঁকে গঞ্জনা শুনতে হয় স্বামী সম্পর্কে। পিত্রালয়ে স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন সতী। কিন্তু শিব ও সতীকে তো পৃথক করা যায় না। সেই চেষ্টা করা হলে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটে। আর তাই সতীর আত্মহত্যা বা দেহত্যাগের পর শিব ত্রিভুবনজুড়ে নটরাজরূপে যে প্রলয়নৃত্য নেচেছিলেন, তাতে টাইম ও স্পেসের সব ধারণা খন্ড-খন্ড হয়ে যাচ্ছিল। পরে দেবীর মৃতদেহকে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে খন্ডবিচ্ছিন্ন করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন বিষ্ণু। দেবীর একেকটি অঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে মর্তের একান্নটি জায়গায়। এই সতী পরজন্মে গিরিরাজকন্যা পার্বতী। তিনি বাংলায় এসে অন্নপূর্ণা। শিব ভিখিরির বেশে তাঁকে

খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যান। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাঁকে অন্নদান করেন দেবী। শিব এখানে দেবতার চেয়ে বড় বেশি মানুষ, জীবনের সাধনায় মগ্ন, তিনি মাধুকরী করে ক্ষুধা নিবারণ করেন। তাঁকে অন্নের জোগান দেন অন্নপূর্ণা। আসলে প্রতিটি জীবকেই প্রকৃতির থেকে ক্ষুধানিবারণের সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়; ভিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যেমন, যিনি ভিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁর অবস্থান যেমন ভিক্ষুকের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব করে, তেমনই প্রকৃতি থেকে যেকোনো জীবের খাদ্যসংগ্রহের বিষয়টিতে জীবের ওপর প্রকৃতির কর্তৃত্ব এসে যায়। কারণ, প্রকৃতির জীবনচক্রেই জীবের জন্ম-যাপন-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতি একদিকে যেমন মাতৃময়ী, তেমনই সে জীবের বাঁচার চালিকাশক্তি। তাই অন্নপূর্ণা বা বাংলার যেকোনো শাক্ত দেবীই প্রথমে প্রকৃতি অর্থাৎ মা। কারণ, তিনিই জন্ম ও জীবনদাত্রী, আবার একই সঙ্গে তিনি সত্তার অপর, তিনিই প্রেয়সী। এ কারণে শিবকে যিনি অন্নভিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি জীবকে খাদ্যের জোগান দেওয়ার অর্থে মা। আবার তিনিই শিবের অর্ধাঙ্গিনী।

আরও বেশ কিছু পৌরাণিক আখ্যান আছে শিব-পার্বতী তথা অন্নপূর্ণা ও ভিক্ষুক শিবকে কেন্দ্র করে। আমরা শুধু বাংলার ভাব ও প্রকৃতিজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত পৌরাণিক আখ্যানের লৌকিক বয়ানের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলাম। তবে এ ক্ষেত্রে আরও কতগুলো বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যিক। মাতৃসাধনা বা প্রকৃতি টোটেমের বাংলায় তন্ত্র সাধনার অনেক অনেক প্রাচীন। মূলত জীবের জৈবিক সত্তার সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ ঘটিয়ে সত্তার বস্তুগত পরমার্থিক প্রকাশ। বাংলায় বস্তুজগৎ মানে কেবল জড়জগৎ নয়, বরং প্রকৃতির প্রাণস্পন্দনের প্রতিটি উপাদানই বস্তু। প্রকৃতি ও সত্তার গুপ্ত-ব্যক্ত আলাপ ও ক্রিয়াই তন্ত্র। প্রকৃতিই জন্মদ্বার এবং যাপনভূমি। আবার মৃত্যুর পরেও মাটিতে দাফন হয়ে অথবা চিতার আগুনে পুড়ে দেহ মিশে যায় প্রকৃতিতেই। সুতরাং প্রকৃতিকেই সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে দেখে এসেছে তন্ত্র। এতে প্রভাবিত হয় বজ্রযানী বৌদ্ধরা। তো এ ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির আধার মহাবিশ্ব। এই ব্রহ্মা-কে যিনি ধরে রেখেছেন তাঁকেই আদ্যাশক্তি, মহাকালী রূপে হাজির করা হয়েছে। যিনি স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে, সময়ের নিয়ন্ত্রক যিনি, তাঁকে মাতৃশক্তি বা জন্মদ্বার হিসেবে দেখেছেন তন্ত্রসাধকেরা। তাই তিনি প্রকৃতির মাঝেও ব্যাপ্ত। প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারলে এবং সেই ভাষার সঙ্গে জৈব ভাষার সংযোগ ঘটাতে পারলেই জীবিতের দুঃখ নিবারণ সম্ভব। এমন চিন্তাই সনাতন শাক্ত ধারার মধ্যে হাজির হয়েছে প্রকৃতিময় টোটেমের

লৌকিক রূপ নির্মাণের মাধ্যমে। কালী প্রতীয়মান করে জীবিতের মাঝে মহাকালের নিত্য উপস্থিতি। যদি তা সময় তথা নশ্বরতার ধারণা হয় এবং মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়, সেখানে অন্নপূর্ণা হচ্ছে খাদ্যজগৎ তথা প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের লৌকিক মেটাফর। শাক্ত সম্প্রদায়ের কথা যখন এলো, তখন এটাও বলা দরকার, ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে একসময় শাক্ত ও শৈবের লড়াই জমে উঠেছিল এই বঙ্গে। অবশ্য তাদের মেলবন্ধনও হয়, কিন্তু তা রাজনৈতিক ও দার্শনিক অর্থে প্রকৃতিকে পুরুষের আধার ধরে নিয়েই। কালীর পায়ের তলায় মহাদেব যেমন মহাকালের পদতলে সত্তার উপস্থিতির রূপক, তেমনই শাক্ত দেবীর কাছে শৈবদেবতার সমর্পণের ন্যারেটিভও বটে। আবার এখানে 'টাইম' (মহাকাল)-এর ধারণা যে সত্তার নিত্য উপস্থিতি ছাড়া মূল্যহীন, সে কথা বলে দেয় পুরুষ ও প্রকৃতির যুগলমূর্তি, কালী হলেন টাইম-এর সৃষ্টির কনসেপ্ট আর শিব হলেন 'স্পেস'-এর বাস্তবতায় জীবনের উপস্থিতি। সময় ও সত্তার ধারণা বাংলার যুগলমূর্তিতে হাজির বহু যুগ থেকে। আবার অন্নপূর্ণা যখন শিবকে ভিক্ষা দেন, তখনো শিবের উপর নারীর তথা শাক্তদেবীর তথা প্রকৃতির কর্তৃত্বের বিষয়টিও প্রতিভাত হয়। বাংলার আর্থ সামাজিক কাঠামোয় একদা নারীর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, শস্যের দেবী অন্নপূর্ণার প্রতিমারূপ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মোট কথা, এসব দেবীমূর্তির সঙ্গে স্থান-কাল-প্রকৃতি সম্পর্কিত। আর অন্নপূর্ণার ইমেজে সৃষ্ট প্রত্যয় এখন খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ খাদ্য, খাদ্যবৈচিত্র্য, খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানবসভ্যতার যে সম্পর্ক, সেই বিষয়টি আজকের এই প্রযুক্তিনির্ভর সময়ে বাড়তি সচেতনতা দাবি করে। কারণ, ক্রমাগত মাত্রাতিরিক্তভাবে নগরায়ণ ও উষ্ণায়নের ফলে প্রথমত প্রাণবৈচিত্র্যে ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছে; অবলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির জীব। ধ্বংস হচ্ছে সবুজ। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে বদলে যাচ্ছে আমাদের চেনা মাটির চরিত্র। আবহাওয়ায় বদল আসছে ক্রমাগত। এ ছাড়া বাজার অর্থনীতি মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে স্বাভাবিক শস্য ফলনের ক্রিয়াকৌশল। রাসায়নিক সার প্রয়োগ, বীজের পেটেন্ট দখল করে স্থানীয় শস্যবীজের বৈচিত্র্যে আধিপত্য কায়েম করছে নানা বহুজাতিক কোম্পানি। এসবের ফলে খাদ্য ও মানবসত্তার নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক আজ নানাভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে। এই অবস্থায়, শস্যসহ খাদ্যসম্ভারের সঙ্গে

মানবসত্তার যে মহাবৈশ্বিক সম্পর্ক, আমাদের দেশীয় কৃষিনিবিড় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তা বোঝা দরকার। অন্নপূর্ণা তাই ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক মধ্যকার ভারসাম্যের বিষয়টিতে সচেতনতা দরকার।

অন্যদিকে এই প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতার সামাজিক প্রতিফলন হিসেবে নতুনভাবে পণ্যবাদের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রকেও হাজির হতে দেখা যাচ্ছে। নারী অর্থাৎ শুধু বায়োলজিক্যাল জেন্ডার আইডেনটিটি নয়, বরং তার প্রকৃতি, শস্য, বীজ এবং জমির উর্বরতার মতো বিষয়গুলো যদি বিবেচনার মধ্যে আনা হয়, তাহলে বলতে হবে নানাভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য আজকের বৈশ্বিক অর্থনীতি ও পণ্যায়নের ফলে বিপর্যস্ত। পুরুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের চেয়ে আজ বরং প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মেল-হেজিমনি একভাবে সাংস্কৃতিক বিকার তৈরি করেছে। নব্য এক পিতৃতন্ত্রের যুগ আজ হাজির আমাদের সামনে। সে কারণে অন্নপূর্ণার মতো লৌকিক বা মিথিক্যাল প্রতিমার অন্তর্বার্তা পাঠ করে আমরা একই সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন ও নতুনভাবে প্রকৃতিমগ্ন হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে পারি।

পৌরাণিক দেবদেবী অনেক সময়েই আসলে কোনো অধিবিদ্যক সংকেত নয়, বরং আমাদের সমাজ, আমাদের ইতিহাস-পূর্ব সময় ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া, প্রাণ-প্রকৃতি ও জগতের মধ্যে নানাভাবে ভারসাম্য ব্যাখ্যার সহায়ক উপাদান। পূজা বা ইবাদতের মতো বাহ্যিক রিচুয়ালের চেয়ে এই উপাদানের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কালে, জল-জমি-জঙ্গল হারিয়ে ফেলার যুগে, খাদ্যসংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনার সময়ে আমরা অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যকে তাই পাঠ করছি অন্ন ও মানুষের সম্পর্ক তথা প্রকৃতি আর জীবজগতের ভারসাম্যের প্রয়োজনে। আমাদের একটাই প্রার্থনা আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

তথ্যসূত্রঃ
বাংলাপিডিয়া